# ভূমিকা

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম সেমেস্টারের PGBNG-CC-1-1 পত্র— 'বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক ব্যাকরণ-১'-এর মডিউল-৩-এর 'ক' অংশের পঠিত বিষয়— 'ধ্বনিতত্ত্ব— বাগযন্ত্র, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির বর্গীকরণ, দ্বিস্বর, সংযুক্ত ব্যঞ্জন, সিলেবলের ধারণা, স্বনিম ও বিস্বনের পার্থক্য, স্বনিম নির্ধারণের পদ্ধতি, বাংলা স্বনিমের বিন্যাস।'

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত বর্তমান সহায়ক আলোচনার উদ্দেশ্য— ধ্বনিতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান। এক্ষেত্রে প্রথমে স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণপ্রকৃতি অনুযায়ী বর্গীকরণের সূত্রে বাংলা স্বরধ্বনি ও মৌলিক স্বরধ্বনি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তারপর বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণপ্রকৃতি অনুযায়ী বর্গীকরণ করা হয়েছে ও তালিকার দ্বারা বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচয়ও উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত দ্বিস্বর, ত্রিস্বর, চতুঃস্বর, পঞ্চস্বর সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও স্বনিম ও বিস্বনের সংক্ষিপ্ত ধারণাও আলোচনার শেষে যুক্ত করা হয়েছে। স্বনিম নির্ধারণের পদ্ধতি বিষয়েও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে বক্ষ্যমান আলোচনায়।

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত', পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়', রামেশ্বর শ'এর 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

— ড. মানস কবি
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ
ও
বারসার,
আশুতোষ
কলেজ।

## ভাষাতত্ত্ব

## ধ্বনিবিজ্ঞান

### বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণপ্রকৃতি নির্ণয়

মানুষের ভাষা হচ্ছে মানুষের কণ্ঠোদ্‌গীর্ণ অর্থবহ ধ্বনি-সমষ্টি। ধ্বনি ভাব-প্রকাশক বা অর্থ-প্রকাশক না হলে এবং সেই ভাব বা অর্থ অন্য মানুষের কাছে সঞ্চারিত করা সম্ভব না হলে তাকে ভাষা বলা যায় না। মনের কোনো ভাব কিংবা ইচ্ছা অপরের কাছে প্রকাশ করতে হলে মানুষ চেষ্টাকৃত ভাবে কণ্ঠ-জিহ্বা-দন্ত-ওষ্ঠ প্রভৃতির (অর্থাৎ বাগযন্ত্রের) সাহায্যে অর্থদ্যোতক ধ্বনি সৃষ্টি করে। একটি বিশেষ বস্তু বা বিশেষ ভাব বোঝাতে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টি-দ্বারা-গঠিত শব্দ প্রয়োগ করে। যেমন, বাংলায় 'জল', হিন্দুস্থানীতে 'পানি', ইংরাজিতে 'water' – একই অর্থদ্যোতক শব্দ।

সচেষ্টভাবে সৃষ্ট ধ্বনি অর্থবান পদ গঠন করে বলে তাকে 'ভাষার ধ্বনি' বা speech sound বলা হয়। ফুসফুস থেকে উত্থিত নিঃশ্বাস বায়ু শ্বাসনালীদ্বয়ের (Trachea) মধ্য দিয়ে কণ্ঠনালীতে (Larynx) আসে এবং সেখান থেকে কণ্ঠ ও মুখবিবর অথবা কণ্ঠ ও নাসিকা পথে বহির্গত হয়। নির্গমনের পথে এই নিঃশ্বাস বায়ু যদি ইচ্ছাকৃত পেশী-সঞ্চালনের ফলে মুখবিবরের কোনো স্থানে বাধা পায় তা হলে বাধার স্থান ও প্রকারভেদে ধ্বনির প্রকারভেদ ঘটে।

প্রত্যেকটি ধ্বনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং উচ্চারণের দিক থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেক ভাষার মূলধ্বনি (phoneme) অপরিবর্তিত এবং উচ্চারণস্থান নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু নানা কারণে যে সব পূরকধ্বনি (Allophone) গড়ে ওঠে সেগুলির কোনো নির্দিষ্ট উচ্চারণস্থান থাকে না। কারণ কথা বলার সময়েই কেবল অপর কোনো ধ্বনির সান্নিধ্যে এলে মূল ধ্বনির এরূপ পরিবর্তন হয়। এই রূপান্তরিত ধ্বনিকে পূরক ধ্বনি বা Allophone বলে। আর মূল ধ্বনিটি ধ্বনিমূল বা phoneme নামে অভিহিত হয়।

ধ্বনির লিপিরূপ হল বর্ণ বা Letter। এক-একটি ধ্বনি এক-একটি চিহ্ন দ্বারা সূচিত হয়। ভাষা বিজ্ঞানে ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ দু'প্রকারে করা হয়। প্রথম প্রকার – অঘোষ (Unvoiced / Breathed) এবং ঘোষবৎ বা সঘোষ (Voiced)। দ্বিতীয় প্রকার – স্বরধ্বনি (Vowel Sound) এবং ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonent Sound)।

স্বরধ্বনি (Vowel Sound) ঃ

যে ধ্বনির উচ্চারণকালে নিঃশ্বাস বায়ু মুখবিবরে কোনোরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাকে স্বরধ্বনি বলে। স্বরধ্বনির লিপিরূপকে স্বরবর্ণ (Vowel Letter ) বলে। উচ্চারণের সময় জিহ্বার অবস্থান এবং ওষ্ঠদ্বয়ের আকুঞ্চণ বা প্রসারণের উপর স্বরধ্বনির প্রকৃতি নির্ভর করে।

স্বরধ্বনির প্রধান শর্ত – নিঃশ্বাসবায়ু মুখের মধ্যে কোথাও বাধা না পেয়ে এই ধ্বনি উচ্চারিত হবে। স্বরধ্বনির বিশেষত্ব নির্ভর করে তিনটি প্রক্রিয়ার উপর ঃ-

ক) জিহ্বাকে সামনে এগিয়ে, পিছন দিকে টেনে নিয়ে, উপরে তুলে কিংবা নীচে নামিয়ে,

খ) আমাদের নীচের চোয়াল উঠিয়ে নামিয়ে,

গ) ওষ্ঠদ্বয় কুঁচকে কিংবা বেশি ফাঁক করে।

– এই তিন উপায়ে স্বরধ্বনির উচ্চারণ হয় বলে, সেই অনুসারে স্বরধ্বনিগুলির নামকরণ করা হয়।

মুখবিবরের মধ্যে জিহ্বার অবস্থান। জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনিগুলিকে নিম্নোক্ত রেখচিত্রে দেখানো হল ঃ

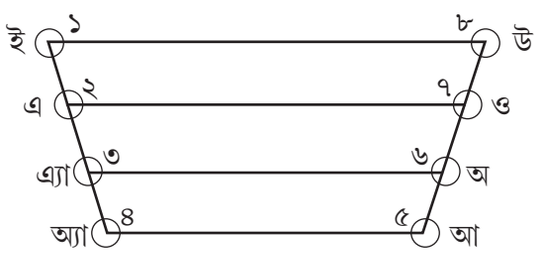


প্রায় চতুর্ভুজ রেখাচিত্র = মুখবিবরের কাল্পনিক চিত্র।
(যেখানে জিহ্বা অবস্থান করে)

১ থেকে ৪ নং স্থান = মুখের সামনের দিক।
(এখানে উচ্চারিত হয় – ই, এ, এ্যা, অ্যা)

৫ থেকে ৮ নং স্থান = মুখের পেছনের দিক।
(এখানে উচ্চারিত হয় – আ, অ, ও, উ)

বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা তেরোটা, কিন্তু সাধু ও চলতি বাংলায় অর্থাৎ কলকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় মাত্র আটটা বিভিন্ন ও বিশিষ্ট স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। সেই আটটি স্বরধনি হচ্ছে – অ, আ, ই, উ, এ, এ্যা, ও, অ্যা। এরা মৌলিক স্বরধ্বনি বা Cardinal Vowels।

এখন নিম্নে মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান দেখানো হল ঃ

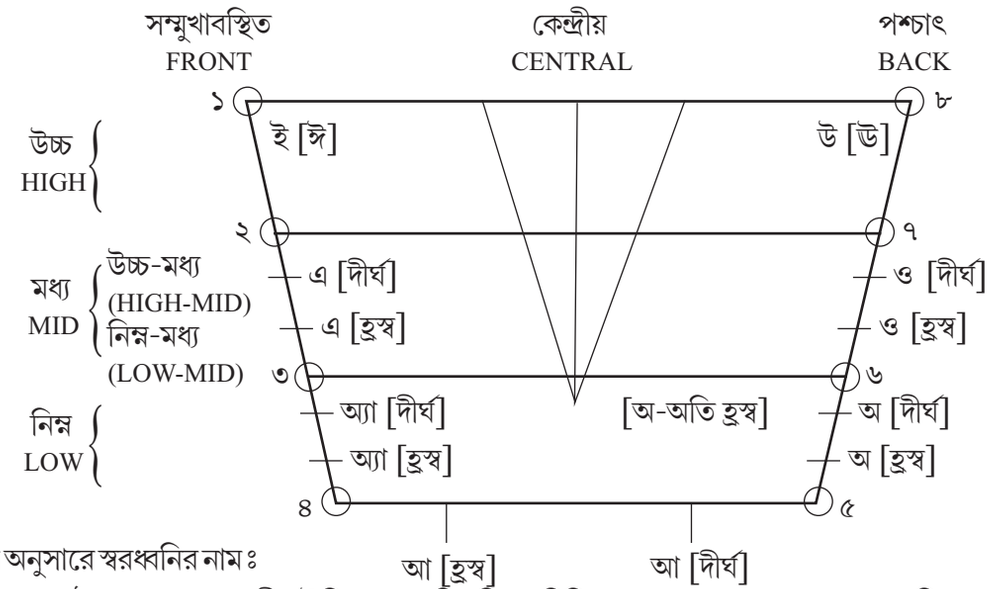


জিহ্বার অবস্থান অনুসারে স্বরধ্বনির নাম ঃ

জিহ্বার অবস্থান ও ওষ্ঠের আয়তন অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনিগুলিকে বিভিন্ন প্রকার নামকরণ করা হয়েছে। নিম্নে সূত্রাকারে সেগুলি বলা হল ঃ

ই, এ, এ্যা, অ্যা, আ – এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা সম্মুখ দিকে প্রসারিত হয় বলে এগুলিকে সম্মুখাবস্থিত (Front) বা এবং প্রসৃত (spread) স্বর বলা হয়।

এগুলির মধ্যে ই (ঈ) - কারের উচ্চারণের সময় জিহ্বা উচ্চে থাকে বলে এর আর এক নাম সম্মুখাবস্থিত উচ্চ-স্বর (High Front Vowel), এ-কারের ক্ষেত্রে জিহ্বা আর একটু নেমে আসে ব'লে তার অন্য নাম সম্মুখাবস্থিত উচ্চ-মধ্য স্বর (High Mid Front Vowel)।

অনুরূপ ভাবে এ্যা-কার সম্মুখাবস্থিত নিম্ন-মধ্য স্বর (Low-Mid Front Vowel) এবং অ্যা-কার সম্মুখাবস্থিত নিম্ন (Low Front Vowel) স্বর নামে অভিহিত হয়।

উ, ও, অ – এই তিন স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় জিহ্বা পশ্চাদ্ দিকে আকৃষ্ট হয় বলে এগুলিকে পশ্চাদ্বস্থিত (Back) এবং ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত বা বর্তুল আকার ধারণ করে ব'লে কুঞ্চিত বা বর্তুল (Rounded) স্বর বলা হয়। তাছাড়া ও-কার এবং অ-কারের উচ্চারণকালে জিহ্বা কণ্ঠের দিকেও আকৃষ্ট হয় বলে এ দুটি কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি।

আ-স্বরটির উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখের সম্মুখ ও পশ্চাদ্পদের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকে এবং এটি নিম্নাবস্থিত স্বর বলে একে 'কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত' (Low Central) ধ্বনি বলা চলে।

ই, উ – ধ্বনি দুটির উচ্চারণে মুখবিবর সংবৃত বা সংকুচিত হয় বলে এ ধ্বনি দুটিকে সংবৃত (Closed) স্বর বলে।

আ (হ্রস্ব), আ (দীর্ঘ) – ধ্বনি দুটির উচ্চারণকালে মুখবিবর বিবৃত বা উন্মুক্ত থাকে বলে এ দুটি বিবৃত (Open) স্বর।

এ, ও – ধ্বনি দুটি উচ্চারণের সময় মুখবিবর অর্ধেক সংবৃত থাকে বলে এদের অর্ধ-সংবৃত (Half-Closed) স্বরধ্বনি বলা হয়।

অ্যা, অ – ধ্বনি গুলির উচ্চারণকালে মুখবিবর প্রায়-বিবৃত হয় বলে এরা অর্ধ-বিবৃত (Half-Open) - স্বর।

বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ অনুযায়ী বর্গীকরণ

| | সম্মুখাবস্থিত (Front)<br>প্রসৃত (Spread) | কেন্দ্রীয় (Central) | পশ্চাদবস্থিত (Back)<br>বর্তুল (Rounded) |
|---|---|---|---|
| উচ্চ (High)<br>সংবৃত (Closed) | ই (ঈ) | | উ (ঊ) |
| উচ্চ-মধ্য (High-Mid)<br>অর্ধ-সংবৃত (Half Closed) | এ | | ও |
| নিম্ন-মধ্য (Low-Mid)<br>অর্ধ-বিবৃত (Half Open) | এ্যা | | অ |
| নিম্ন (Low)<br>বিবৃত (Open) | অ্যা | আ | |

সানুনাসিক স্বর (Nasalised Vowels) ঃ

স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু মুখ দিয়ে বহির্গত হয়। এই বায়ু যদি যুগপৎ নাসিকা পথেও নির্গত হয়, তা হলে উক্ত স্বরধ্বনি সানুনাসিক হয়ে স্বরবর্ণের নাসিক্য রূপটি প্রস্ফুট করা হয়। সরল ও যৌগিক নির্বিশেষে সমস্ত বাংলা স্বরধ্বনির সানুনাসিক উচ্চারণ

সম্ভব। উদাহরণ –

| | | |
|---|---|---|
| অঁ | – | সঁপা |
| আঁ | – | আঁশ |
| ইঁ | – | ইঁদুর |
| উঁ | – | উঁই |
| এঁ | – | এঁটো, এঁচড় |
| ওঁ | – | ওঁরা |
| অ্যাঁ | – | অ্যাঁ ! |

উল্লিখিত নিয়ম ছাড়া বর্গের পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম প্রভৃতি নাসিক্য ধ্বনির সান্নিধ্যে এলেও বাংলায় স্বরধ্বনি আনুনাসিক ভাবে উচ্চারিত হয়। যথা – মা = ম্ + আঁ = মাঁ।

যৌগিক স্বরধ্বনি বা সন্ধ্যক্ষর ঃ

একাধিক স্বরধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বা সন্ধিস্বর বলে। দুটি স্বরধ্বনির সমবায়ে দ্বিস্বর – ধ্বনির (Dipthong) উদ্ভব হয়। অনুরূপ ভাবে তিনটি স্বর-ধ্বনির সংযোগে ত্রিস্বর, চারটি স্বর-ধ্বনির উচ্চারণে চতুঃস্বর, পাঁচটি স্বর-এর সমবায়ে পঞ্চস্বর গঠিত হতে পারে।

বাংলা বর্ণমালায় দুটি মাত্র যৌগিক স্বর আছে – ঐ (= অই > ওই), ঔ (= অউ > ওউ)। অবশিষ্ট যৌগিক স্বরধ্বনিগুলির জন্য নির্দিষ্ট কোনো বর্ণ নেই। এগুলির মৌলিক বর্ণগুলিকে, একক বা য়-কারের সঙ্গে যুক্ত করে, পাশাপাশি লিখে প্রকাশ করা হয়।

চলিত ভাষায় এরকম ২৫-টি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে। যেমন – ই এ (নিয়ে), ই আ (ইয়ার), ই ও (প্রিয়), এ ই (খেই), এ য়া (খেয়া) ইত্যাদি।

বাংলায় দ্রুত উচ্চারণে তিনটি স্বরধ্বনির যৌগিক রূপ (ত্রিস্বর) পাওয়া যায়। যেমন – অ ওই (নওই, কওই), আইও (যাইও, খাইও), আইয়ে (নাইয়ে, খাইয়ে) ইত্যাদি।

চারটি স্বরধ্বনির সমবায় – আওয়ায় (হাওয়ায়, খাওয়ায়), এওয়ায় (নেওয়ায়) ইত্যাদি।

পাঁচটি স্বরের যৌগিক রূপ – আওয়াইও (খাওয়াইও), আওয়াইয়া (খাওয়াইয়া) ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ধ্বনিগুলিকে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলে আর যৌগিক স্বরধ্বনির উদ্ভব হয় না, স্বরগুলি পৃথক থেকে যায়।

## ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণপ্রকৃতি নির্ণয়

মানুষের ভাষা হচ্ছে মানুষের কণ্ঠোদ্‌গীর্ণ অর্থবহ ধ্বনি-সমষ্টি। ধ্বনি ভাব-প্রকাশক বা অর্থ-প্রকাশক না হলে এবং সেই ভাব বা অর্থ অন্য মানুষের কাছে সঞ্চারিত করা সম্ভব না হলে তাকে ভাষা বলা যায় না। কোনো ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করাই হচ্ছে ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। ভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং পরিণত অবস্থার ব্যাকরণ আলোচনা ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যাকরণ আলোচনার ক্ষেত্রে যে-সব বিষয় অবলম্বন করা হয় সেগুলি হচ্ছে - ক) ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), খ) শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics), গ) রূপতত্ত্ব (Morphology) এবং ঘ) পদতত্ত্ব বা বাক্যরীতি (Syntax)। ধ্বনিবিচার (Phonemics) ও ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) ধ্বনিবিজ্ঞানের অঙ্গীভূত।

সচেষ্টভাবে সৃষ্ট ধ্বনি অর্থবান পদ গঠন করে বলে তাকে 'ভাষার ধ্বনি' বা Speech Sound বলা হয়। ফুসফুস থেকে উত্থিত নিঃশ্বাস বায়ু শ্বাসনালীদ্বয়ের (Trachea) মধ্য দিয়ে কণ্ঠনালীতে (Larynx) আসে এবং সেখান থেকে কণ্ঠ ও মুখবিবর অথবা কণ্ঠ ও নাসিকা পথে বহির্গত হয়। নির্গমনের পথে এই নিঃশ্বাস বায়ু যদি ইচ্ছাকৃত পেশী-সঞ্চালনের ফলে মুখবিবরের কোনো স্থানে বাধা পায় তা হলে বাধার স্থান ও প্রকারভেদে ধ্বনির প্রকারভেদ ঘটে।

ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ দু'প্রকারের হয়। প্রথম প্রকার - অঘোষ (Unvoiced) এবং ঘোষবৎ বা সঘোষ (Voiced)। দ্বিতীয় প্রকার - স্বরধ্বনি (Vowel Sound) এবং ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant Sound)।

**সঘোষ ও অঘোষ**

কণ্ঠনালীর মধ্যে দুটি পাতলা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আছে। এ দুটি কণ্ঠতন্ত্রী (Vocal Chords) নামে অভিহিত হয়। কতকগুলো ধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠতন্ত্রী প্রসারিত হয়ে নিঃশ্বাস বায়ু বহির্গমনের পথ রোধ করে। বায়ুপ্রবাহ তখন ঝিল্লিদ্বয়কে জোরে সরিয়ে দিয়ে নির্গত হয়। ফলে কণ্ঠতন্ত্রীতে যে কম্পন জাগে তাতে ঘোষ (Voice) বা সুর-সহজাত ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এরূপ ঘোষ বা সুরবিশিষ্ট ধ্বনির নাম সঘোষ বা ঘোষবৎ ধ্বনি। বাংলা স্বরধ্বনিগুলো এবং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি ঘোষবৎ।

আর, যে-সব ধ্বনি উচ্চারণ করবার সময় কণ্ঠতন্ত্রী স্বাভাবিকভাবে অবস্থান করে, সেগুলি অঘোষ ধ্বনি। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি এবং শ, ষ, স অঘোষ ধ্বনি।

স্পর্শ-বর্ণ (Occlusiues) / স্পৃষ্টধ্বনি ঃ

ক থেকে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার কোনো অংশ মুখবিবরে কোনো-না-কোনো স্থানকে স্পর্শ করে বলে এ-গুলিকে স্পর্শ-ধ্বনি বলে। এবং কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ - এই পাঁচটি নিঃশ্বাস বায়ুর বাধার স্থান হয় বলে এই স্থানগুলির নামানুসারে ধ্বনিগুলিকে পাঁচটি বর্গ বা শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা -

ক-বর্গ ঃ ক, খ, গ, ঘ, ঙ - কণ্ঠ্য ধ্বনি

চ-বর্গ ঃ চ, ছ, জ, ঞ - তালব্য ধ্বনি

ট-বর্গ ঃ ট, ঠ, ড, ঢ, ণ - মূর্ধণ্য ধ্বনি

ত-বর্গ ঃ ত, থ, দ, ধ, ন - দন্ত্য ধ্বনি

প-বর্গ ঃ প, ফ, ব, ভ, ম - ওষ্ঠ্য ধ্বনি

**নাসিক্য-ধ্বনি বা নাসিক্যবর্ণ ঃ**

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রত্যেক বর্গের পঞ্চম ধ্বনি [ঙ (উঁওঁ), ঞ (হুঁওঁ), মূর্ধণ্য-ণ, দন্ত্য-ন, ম] নাসিক্যধ্বনি বা নাসিক্যবর্ণ। এগুলির উচ্চারণ কালে নিঃশ্বাস বায়ু নাসা-পথে কিংবা একযোগে মুখ ও নাসা-পথে নিঃসৃত হয়।

**উষ্ম বর্ণ বা শিস্‌ধ্বনি ঃ**

শ্বাস বায়ুর নির্গমন কালে বাধার প্রকৃতি কীরূপ হবে সে অনুসারে ধ্বনির প্রকৃতি নির্ভর করে। বাধা দু'প্রকার সম্পূর্ণ এবং আংশিক। সম্পূর্ণ বাধা স্পৃষ্ট ('ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত) এবং আংশিক বাধায় উষ্ম ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যখন বায়ু আংশিক বাধাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন কোন সংকীর্ণ পথ দিয়ে বায়ু বেরিয়ে আসে, তখন শিস্ দেবার মত একপ্রকার ধ্বনি নির্গত হয়, তাই-ই 'শিস্‌ধ্বনি' বা উষ্মধ্বনি। বাংলায় শ, ষ, স, হ - উষ্ম ধ্বনি।

**ঘৃষ্ট-ধ্বনি ঃ**

বাংলা ভাষায় 'চ' ধ্বনিগুলির উচ্চারণ-কালে জিহ্বা ও তালুর স্পর্শের পরেই উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়, এই কারনে 'চ'-বর্গীয় ধ্বনিগুলিকে (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ) ঘৃষ্টধ্বনি বলা হয়।

**অর্ধস্বর বা তরলস্বর (Semi Vowels, Liquids) ঃ**

য, র, ল, ব - এই চারটিকে আমরা বলি অন্তঃস্থ ধ্বনি। এর কারণ এরা উষ্মধ্বনি এবং স্পর্শধ্বনির অভ্যন্তরে বা ভেতরে থাকে। এদের ইংরেজি নাম Semi Vowels – বাংলায় অর্ধস্বর। কেননা এদের অন্তর্নিহিত অ-কারকে বাদ দিলে য > ই, র > ঋ, ল > ঌ, য > উ (W) পাওয়া যায়।

**অর্ধব্যঞ্জন (Sonant) ঃ**

যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো স্বয়ং অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির বাহকরূপে অক্ষর (Syllable) সৃষ্টি করতে পারে, তাদের অর্ধব্যঞ্জন বলে। ন্, ম্, র্, ল্ - এরূপ অর্ধব্যঞ্জন।

**মহাপ্রাণ, অল্পপ্রাণ ঃ**

প্রতিটি বর্গের প্রথম চারটি ধ্বনির মধ্যে দ্বিতীয়টি এবং চতুর্থটি - অর্থাৎ ক-বর্গের খ, ঘ; চ-বর্গের ছ, ঝ; ট-বর্গের ঠ, ঢ; ত-বর্গের থ, ধ; প-বর্গের ফ, ভ – এদের উচ্চারণে কিছু বিশেষত্ব আছে। এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালীর পেশী আকুঞ্চিত হয়ে যুগপৎ বাধার সৃষ্টি করে। ধ্বনিগুলি পূর্ববর্ণের সঙ্গে 'হ'-জাতীয় ধ্বনির সংযোগ সৃষ্ট। অর্থাৎ ক + হ = খ, প + হ = ফ, চ + হ = ছ ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় ধ্বনিকে (হ-জাতীয় ধ্বনি) বলে 'প্রাণ' (Aspiration)। সেজন্য এই ধ্বনিগুলি মহাপ্রাণ (Aspirate) ধ্বনি। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনিগুলিতে এই প্রাণ বা নিঃশ্বাস নেই, তাই সেগুলি অল্পপ্রাণ বা Unaspirated ধ্বনি। যেমন - ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।

**ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান (১)**

| পঞ্চ বর্গ ⇩ / উচ্চারণ স্থান ⇩ | | অঘোষ (Voiceless) | | ঘোষ (Voiced) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | অল্পপ্রাণ | মহাপ্রাণ | অল্পপ্রাণ | মহাপ্রাণ | নাসিক্য |
| ক-বর্গ | কণ্ঠ | ক (K) | খ (Kh) | গ (G) | ঘ (Gh) | ঙ (N) |
| চ-বর্গ | তালু | চ (C) | ছ (Ch) | জ (J) | ঝ (Jh) | ঞ (N) |
| ট-বর্গ | মূর্ধা | ট (T) | ঠ (Th) | ড (D) | ঢ (Dh) | ণ (N) |
| ত-বর্গ | দন্ত | ত (T) | থ (Th) | দ (D) | ধ (Dh) | ন (N) |
| প-বর্গ | ওষ্ঠ | প (P) | ফ (Ph) | ব (B) | ভ (Bh) | ম (M) |

**যৌগিক স্বরধ্বনি / সন্ধ্যক্ষর / সন্ধিস্বর ঃ**

একাধিক স্বরধ্বনিকে যদি একটি মাত্র প্রচেষ্টায় উচ্চারণ করা যায়, তবে যৌগিক স্বর বা সন্ধিস্বর হয়। অর্থাৎ যে আটটা মৌলিক স্বরধ্বনি আছে তাদের সমবায়ে বা মিলনে নানারকম যৌগিক স্বরধ্বনি সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে মাত্র দুটোর জন্য নির্দিষ্ট বর্ণ বাংলা বর্ণমালায় মেলে। এ (ও + ই) এবং ঔ (ও + উ)। অবশিষ্ট যৌগিক স্বরধ্বনিগুলির জন্য নির্দিষ্ট কোনো বর্ণ নেই। এগুলির মৌলিক বর্ণগুলিকে, একক বা য়-কারের সঙ্গে যুক্ত করে, পাশাপাশি লিখে প্রকাশ করা হয়।

চলিত ভাষায় এরকম ২৫-টি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে। যেমন - ইএ (নিয়ে), ইআ (ইয়ার), ইও (প্রিয়), ইউ (মিউ), এই (খেই), এয়া (খেয়া), এও (চেও), এউ (ঘেউ), এ্যও (ম্যাও), এ্যায় (দ্যায়), আই (খাই) ইত্যাদি। যখন তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করা হয় তখন পাশাপাশি অবস্থিত পূর্বোক্ত দুটো মৌলিক স্বরধ্বনিই যৌগিক স্বরধ্বনি হয়ে যায়। আবার যখন ধীর গতিতে উচ্চারণ হয় তখন দুটো পৃথক স্বরধ্বনি হিসাবেই তারা প্রতিভাত হয়।

তিনটি স্বরধ্বনির মিশ্র বা যৌগিক স্বরধ্বনিও বাংলায় সম্ভব। যেমন - এইও (পেরিও / পেরিয়ো), আইয়ে (গাইয়ে), আউই (হাউই), ওয়াই (ধোয়াই), উইয়ে (চুঁইয়ে) ইত্যাদি।

| বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থান (২) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উচ্চারণের রীতি **Manner of Articulation** | | | কণ্ঠনালী **Glottal** | কণ্ঠ (কোমল তালু ও জিহ্বামূল) | কঠিন তালুর উর্ধ্বভাগ ও জিহ্বামধ্য | মূর্ধা বা তালুর শিরোভাগ উল্টানো জিহ্বাগ্র | দন্তমূল ও জিহ্বাগ্রভাগ | দন্ত ও জিহ্বাগ্রভাগ | দন্ত ও ওষ্ঠ (অধর) | ওষ্ঠদ্বয় |
| স্পর্শধ্বনি | অল্পপ্রাণ | অঘোষ | | ক | চ | ট | | ত | | প |
| | | ঘোষ | | গ | জ | ড | | দ | | ব |
| | মহাপ্রাণ | অঘোষ | | খ | ছ | ঠ | | থ | | ফ |
| | | ঘোষ | | ঘ | ঝ | ঢ | | ধ | | ভ |
| | | নাসিক্য ঘোষ | | ঙ | ঞ | ণ | ন | | | ম |
| কম্পন জাত (ঘোষ) | | | | | | | র | | | |
| পার্শ্বিক (ঘোষ) | | | | | | | ল | | | |
| তাড়ন জাত | অল্পপ্রাণ | | | | | ড় | | | | |
| | মহাপ্রাণ | | | | | ঢ় | | | | |
| উষ্মধ্বনি | অঘোষ | | ঃ বিসর্গ | | | | | | ফ (f) | |
| | ঘোষ | | হ | | | | | | ভ (v) | |
| | শিস্‌ধ্বনি (অঘোষ) | | | | শ | ষ | স | | | |
| অর্ধস্বর (ঘোষ) | | | | | য় = y | | জ = z (ঘোষ) | | | (ওয়) = w |

# ভাষাতত্ত্ব

## স্বনিম বা মূলধ্বনি

ভাষায় কিছু মূলধ্বনি থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনোটির একাধিক উচ্চারণ বৈচিত্র্য (Variations) থাকে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে উচ্চারণ বৈচিত্র্যসহ প্রত্যেকটি মূলধ্বনিকে বলে 'স্বনিম' বা 'ধ্বনিমূল' বা 'ধ্বনিকল্প' (Phoneme)। মূলধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্যকে বলেন 'উপধ্বনি' বা 'বিস্বন' (Allophone)। ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী হেনরি সুইট ও ফরাসি ধ্বনিতত্ত্ববিদ পল প্যাসি উচ্চারণীয় ধ্বনিতত্ত্বের প্রেক্ষিতে ধ্বনি যে শব্দের অর্থগত পার্থক্য নির্দেশ করে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 'ফোনিম' শব্দটি আবিষ্কার করেন ফরাসি ভাষাতত্ত্ববিদ লুই আভে, তবে তিনি এর আধুনিক অর্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কজান স্কুলের কুর্ত্যনে এবং ক্রুজেস্কি এই ফোনিমতত্ত্বের কেন্দ্রটিকে অনেক প্রশস্ত করে তোলেন। তাঁরা আধুনিক বর্ণনামূলক ও সংগঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের কেন্দ্রটিকে অনেক প্রশস্ত করে তোলেন। আধুনিক কার্যমূলক ও সংগঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের জনক সোস্যুর 'ফোনিম' শব্দটি প্রয়োগ করার পরেই পাশ্চাত্যে ফোনিমতত্ত্ব গুরুত্ব লাভ করে।

স্বনিমের সংজ্ঞা স্বরূপ বলা হয় – যে সব ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত এককের মধ্যে পারস্পরিক স্বনিমীয় বিরোধ থাকে সেই ধ্বনিগত এককগুলির প্রত্যেকটিকে ফোনিম বা স্বনিম বলে।

অনেকেরই খুব স্পষ্ট ধারণা নেই যে নিজের ভাষায় সঠিকভাবে ক'টি ধ্বনি আছে। অথচ আমরা শব্দ বা পদ সাজিয়ে অজস্র বাক্য ব্যবহার করে ভাবের আদান প্রদান করি। এই শব্দ বা পদ গঠিত হয় উচ্চার্য ধ্বনি এবং তার লিখিত বর্ণ দিয়ে। আমাদের বর্ণমালায় যে যে বর্ণ আছে, ঠিক সেই সেই ধ্বনি কিন্তু নেই। যেমন – ঈ, ঊ, ঋ, ঞ, ণ, য, ষ, ং ইত্যাদি। আবার আমরা অ্যা-ধ্বনিটি উচ্চারণ করলেও এর নিজস্ব কোনো বর্ণ চিহ্ন নেই। লিখিত ভাষাতেই যেখানে ধ্বনি ও বর্ণে এই অসামঞ্জস্য, সেখানে মৌখিক ভাষাগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের মুখের ভাষা এক অখণ্ড নিরবিচ্ছিন্ন ধ্বনির প্রবাহ এবং কোনো দুটি ধ্বনির উচ্চারণ একরকম নয়। বিভিন্ন ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আমরা বুঝি আমাদের ভাষায় ধ্বনির কোনো সীমা সংখ্যা নেই, তা অসংখ্য, অনন্ত। অথচ ছোটোবেলা থেকে ব্যাকরণ বই পড়ে আমরা তো অন্য এক ধারণাতেই পৌঁছেছি, জেনেছি নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বরধ্বনি ও ব্যাঞ্জনধ্বনির কথা। যাদের বিভিন্ন বিচিত্র সজ্জা ও বিন্যাসই আমাদের কথায় বারবার ফিরে ফিরে আসে।

সাধারণ মানুষ ভাষা ব্যবহারকালে 'ফোন'-এর সূক্ষ্ম পার্থক্য খেয়াল না করলেও একটি ধ্বনির ব্যবহারিক স্বাতন্ত্র্যকে ঠিকই বুঝে নেন। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ভাষাতত্ত্বের শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও কেউ সহজেই অবাঙালির বাংলা উচ্চারণের ভুলটি ধরে ফেলে তা শুধরে দিতে পারেন। যেমন কোনো ইংরেজ নিজস্ব ভাষা সংস্কারে 'কাল' না বলে 'খাল' উচ্চারণ করলে, একজন তথাকথিত স্বল্প শিক্ষিত বাঙালিও তাকে শুধরে দেন এবং অর্থগত বিপর্যয়টি বুঝিয়ে দেন। সুতরাং ফোনিম হল সেই ধ্বনি যা একটার পরিবর্তে আরেকটা ব্যবহার করলে একটা শব্দ সম্পূর্ণ অন্য শব্দে পরিণত হতে পারে। ফোনিমগুলির ধর্মই হল পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ বা স্বাতন্ত্র্য (Contrast বা Opposition)। যে পার্থক্যের ফলে আর সব বিষয়ে মিল থাকলেও দুটি শব্দ আলাদা হয়ে যায় চেহারায় ও অর্থে। যেমন – কাল - খাল ('ক' এর বদলে 'খ') বা চাল - ছাল ('চ' এর বদলে 'ছ') এর পার্থক্যের কথা ভেবেই ব্লুমফিল্ড ফোনিম-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'a minimum unit of distinctive features', অর্থাৎ ভাষার প্রতিটি স্বতন্ত্র ধ্বনিই তার ফোনিম।

ফোনিম সন্ধান ও তার সংখ্যা নিরূপনের কাজে নানা সংশয় ও বিভ্রমের সম্ভবনা থেকেই ধ্বনিবিজ্ঞানীরা ভ্রান্তি এড়াতে দুটি পরীক্ষা উদ্ভাবন করেছেন –

ক. বিকল্পন পরীক্ষা – যে ধ্বনিগুলিকে আলাদা মনে হয় সেগুলি সত্যিই আলাদা কিনা বুঝতে একটি শব্দে আলাদা মনে হওয়া ধ্বনিগুলিকে একটির জায়গায় আরেকটি বসিয়ে জ্ঞাপনের মাধ্যমে জেনে নেওয়া যায় যে শব্দটি পরিবর্তিত হচ্ছে কি না। যেমন 'কাল' শব্দে 'ক' এর বদলে 'খ', 'চ', 'ছ', 'ম' বসালে শব্দের চরিত্র বদলে যায়। আমরা পাই যথাক্রমে 'খাল', 'চাল', 'ছাল', 'মাল' – এভাবেই ভাষাবিজ্ঞানী নিশ্চিত হতে পারে বাংলা ভাষায় 'ক', 'খ', 'চ', 'ছ', 'ম' আলাদা ফোনিম।

খ. ন্যূনতম শব্দজোড়ের পরীক্ষা – এই পরীক্ষায় তৈরি করা হয় এমন শব্দজোড় যেখানে দুটি শব্দের মধ্যে অন্যান্য ধ্বনির হুবহু মিল থাকে। কেবলমাত্র একটি ধ্বনির পার্থক্যেই ঐ নির্দিষ্ট ভাষায় শব্দ দুটির অর্থ পৃথক হয়ে যায়। যেমন – কল - খল, ডাক - ঢাক, জামা - ঝামা, চুরি-ছুরি ইত্যাদি। ন্যূনতম শব্দজোড় নীতি থেকে আমরা বুঝি ধ্বনি দুটি বৈশিষ্ট্যগতভাবে খুব আলাদা হলে তাদের মধ্যে শোনার বা বোঝার ক্ষেত্রে বিভ্রমের সম্ভাবনা কম থাকে। তাই 'কাক' ও 'নাক' শব্দ জোড়ে 'ক' ও 'ন' ফোনিম নির্ধারণে জটিলতা নেই, কিন্তু 'কাল' ও 'খাল' শব্দজোড়ে 'ক' ও 'খ' ধ্বনি দুটি উচ্চারণগতভাবে কাছাকাছি বলেই তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটে বেশি।

ধ্বনির এই একটি বোধকে বলা হয় ফোনিমের বোধ, আর ধ্বনিপ্রতিবেশ বা অবস্থানপ্রতিবেশে একটি ফোনিমের যে উচ্চারণ বৈচিত্র্য, তাকে বলে 'অ্যালোফোন' বা 'বিস্বন' বা 'ধ্বনিবিকল্প'। এইদিক থেকে বলা যায়, ফোনিম হল কয়েকটি অ্যালোফোনের সমষ্টি বা ঐক্যসূত্র।